???? ????- ??

দেবতোষ দাশ

পার্লারের কাচের দরজা ঠেলে বেরোয় অনিন্দিতা। বাইরে থইথই করছে জ্যোৎস্না। সামান্য দু-পা হেঁটেই রিক্সা স্ট্যান্ড। ওই অবসরেই চাঁদের আলো লাফ দেয় অনিন্দিতার পিঠে। সদ্য ম্যাসাজ করা মসৃণ পিঠে থাকতে পারে না সে আলো। পিছলে যায়। গিয়ে পড়ে বন্ধ-রকমারি স্টোর্সের সামনে দাঁড়িয়ে গুলতানি করা তিনটি ছেলের গায়ে। তারা লাফিয়ে ওঠে।

অনেকটা-কাটা ব্লাউজ। চওড়া পিঠের বড় অংশ অনাবৃত। তারা শুঁকে নেয় অনিন্দিতার পিঠ। চাটতে চায়। পারে না। অনিন্দিতা রিক্সায় উঠে পড়ে।

রিক্সা এখন মোটর-চালিত। আগের মতোই রোগা-কাঠি রিক্সার খাঁচা, রিক্সাওয়ালাও তাই, কেবল একটি মোটর বসেছে। পা-তুলে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে থাকে চালক, শোঁ শোঁ করে এগিয়ে যায় রিক্সা। অনিন্দিতা খেয়াল করে পেছনে বাইকে তিনজন। ওরা পিছু নিয়েছে। আঁচল টানে অনিন্দিতা। পিঠ ঢাকে। ব্যাগ থেকে বার করে ফোন। আজ রোববার। রাস্তাঘাট কেমন ফাঁকা ফাঁকা। দশটা বাজতে দশ।

সেই কখন ঢুকেছে পার্লারে! পৌনে সাতটা! এত ভিড়। তাছাড়া আজ অনেক কিছু করাবার ছিল। ওয়াইন ফেসিয়াল। ভ্রু প্লাকিং। ট্যান রিমুভাল। মুখে-হাতে-গলায়। পিঠে। এটা আগে করত না। পার্লারের মেয়েটাই একদিন বলল, দিদি এবার থেকে ট্যান রিমুভ করে দেব আপনাকে, দেখবেন জেল্লা কাকে বলে! প্রথমবারেই ফল এল হাতেনাতে। যে-সঞ্জয় মুখ তুলেই চাইত না, সপ্তাহান্তেও ঘুমিয়ে পড়ত পাশ ফিরে, নজর এড়াল না তারও। কী ব্যাপার অনি, চকচক করছ! গ্ল্যামার বেড়ে গেল যে!

এলোমেলো হাওয়া আর জ্যোৎস্না কেটে এগিয়ে চলে মোটর-রিক্সা। সামনেই মস্ত মাঠ। ফুটবল খেলা হয়। মাঠের ডানদিক দিয়ে রাস্তা। এদিকটা শুনশান। মাঠ পেরিয়ে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। দু'দিকে ঝোপঝাড়। মস্ত এক পুকুর। দুটো বিশাল তেঁতুল গাছ। কিছুটা পথ পেরিয়ে তারপর ওদের কমপ্লেক্সের বাউন্ডারি শুরু। আম্রকুঞ্জ। কমপ্লেক্সের কাছাকাছি পৌঁছে গেলে ভয় নেই। অনেকগুলো দোকান আছে।

কিন্তু এখনও বেশ খানিকটা যেতে হবে। মোটর-রিক্সা হলেও সময় নেহাৎ কম লাগবে না! পেটের ভেতরটা কেমন গুড়গুড় করে। ফোনে সঞ্জয়কে ধরতে চায়। উফ, ফোন বন্ধ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ দেখছে। আজ নিশ্চয়ই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের খেলা আছে। অথবা ইউ টিউবে সিনেমা দেখছে। ছুটির দিন এভাবেই কাটায়।

ফেব্রুয়ারির গোড়া। বাতাসে হালকা শীত। অনিন্দিতা শিরশিরিয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক কারণে যতটা, তার থেকেও বেশি

মোটরবাইকটার সরব উপস্থিতিতে।

খেলার মাঠ বাঁয়ে রেখে এগিয়ে যায় রিক্সা।

‘ভাই, একটু জোরে চালাও না!’

‘এ তো ব্যাটারির রিস্কা বৌদি! জোরেই তো যাচ্ছি। যখন পা-রিস্কা ছিল, এত ইস্পিড ছিল না!’

ঘাড়টা আলতো ঘোরায় অনিন্দিতা। প্রায় পাশে পাশেই আসছে বাইকটা। পাশের ফ্ল্যাটের মিত্রদাকে ফোন করবে?

ফোন করার আগেই বাইকটা রিক্সাকে টপকায়। চলে আসে সামনে। ছেলেগুলো হাসে। দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে। অনিন্দিতা ফোন কানে দিয়েই থাকে। ফোন খোলা আছে জানলে, হয়ত দু’বার ভাববে। অবশ্য আজকাল কেউই কোনও কিছু ঘটানোর আগে, ভাবে বলে মনে হয় না। ফোন কানে দিয়েই অনিন্দিতার চোখ তীক্ষ্ণ। গতিবিধি নজর করে ছেলেগুলোর।

রিক্সাওয়ালাটা লিকলিকে। সামান্য বাধা দিতে পারবে কিনা সন্দেহ! অবশ্য তিনজন মুসকো জোয়ানের সঙ্গে পারবেই বা কী করে! ব্যাটা এক ভঙ্গিতে বসে আছে পা-টা তুলে! রিক্সাটা দ্রুত চালিয়ে তাকে বিপন্মুক্ত করার কোনও ইচ্ছে কি ওর আছে?

‘আরে ভাই একটু জোরে চালাও না!’

কানে ফোন নিয়েই বলে অনিন্দিতা। যতটা গলা উঁচিয়ে বলতে চেয়েছিল, পারে না। অদ্ভুত ফ্যাসফ্যাসে একটা আওয়াজ বেরোয়। রিক্সাচালক হাসে। খ্যাক-খ্যাক। ওর হাসিতে অভিসন্ধি দেখে অনিন্দিতা। কী ব্যাপার! এই ব্যাটাও জড়িত নয় তো! ইচ্ছে করে আস্তে চালিয়ে সুবিধে করে দিচ্ছে জানোয়ারগুলোর! মুহূর্তে গলা খাঁকারি দিয়ে, রুদ্ধ কণ্ঠ মুক্ত করে চিৎকার করে অনিন্দিতা।

‘জোরে চালাতে বলছি না তোমাকে! হাসছ যে!’

‘সবার একটা ক্যাপাসিটি আছে বৌদি, এ কি আর হিরো হন্ডা নাকি!’

আবার হাসে চালক। সামনের বাইকটা জোরে বেরিয়ে যায়। কিছুটা দম নেয় অনিন্দিতা। চলে গেল কি ওরা? ওর চিৎকার শুনতে পেয়েছে তাহলে? পেরিয়ে যায় আলো-আঁধারি খেলার মাঠ। চারপাশে এবার বুনো ঝোপ-ঝাড়। রাস্তায় আলো আছে। টিমটিমে।

দু’একদিনের মধ্যেই মাঘি পূর্ণিমা। আকাশে ফাটিয়ে চাঁদ। শুভ্র জ্যোৎস্না, পুলকিত যামিনী। গায়ে কোনও পুলক জাগে না অনিন্দিতার। পেটের ভেতরের মোচড়ানিটা যদিও সামান্য কমেছে। আঁচলের ডগা দিয়ে মুখটা মুছে নেয়। এই হালকা শিরশিরে আবহাওয়ায় কেমন ঘেমে-নেয়ে উঠেছে সে!

ট্যান রিমুভ আজ না-করালেই হত! ঘন্টাখানেক আগেই হয়ে যেত তাহলে! তখন কি আর এত নিঝুম ছিল চারপাশ। ন’টা আর দশটায়, মফস্বলে বেশ তফাৎ। পার্লারের মেয়েটা এমন জোর করল, বসে যেতেই হল। শীত গেল সদ্য, এখনই নাকি ট্যান-রিমুভাল বেশি দরকার। শীতে আমরা ছাতা ব্যবহার করি না, তাই ট্যান বেশি পড়ে। পিঠে তো সবার আগে করতে হবে। ওই খোলা জায়গাতেই তো রোদ লাগে বেশি। মেয়েটা এইসব ভুজুংভাজুং দিয়ে বসিয়ে দিল তাকে। ইস্ তখন ঘড়িটা যদি একবার দেখত! সঞ্জয়কে বলতে পারত স্কুটার নিয়ে একবার আসতে। সঞ্জয়ের কথা আবার মাথায় আসতেই অসম্ভব রাগ হয়। আচ্ছা আক্কেল এই লোকটার, রাত দশটা বাজে, বউ ফিরছে না, কোনও তাপ-উত্তাপ নেই!

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে তেঁতুলের ঝাঁকড়া ছায়া। ভূতের মতো দণ্ডায়মান। পুকুরের পাশ দিয়ে এগোয় রিক্সা। এরপর তেঁতুলতলা পেরিয়ে গেলেই ধড়ে প্রাণ আসবে। জয় বাবা লোকনাথ! ডানহাতের তর্জনিটা বার তিনেক কপালে ঠেকায়।

কিন্তু পুকুর পেরোতেই রিক্সাচালক ব্রেক কষে। ক্যাঁ-আ-আ-চ। দাঁড়িয়ে যায় রিক্সা। দাঁড় করাতে বাধ্য হয় চালক। তেঁতুলতলার সামান্য আগে, রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেই বাইকটা। বাইক থেকে নেমে তিনটে ছেলেই আটকেছে পথ।

বিস্ফারিত চোখে ওদের দিকে চেয়ে থাকে অনিন্দিতা। চিৎকার করতেও ভুলে গেছে সে। অবশ্য চিৎকার করেও কী লাভ! এই তল্লাটে কোনও জনমনিষ্যি নেই।

তেঁতুলতলা পেরিয়ে কিছুটা যেতে হবে, তারপর আম্রকুঞ্জ কমপ্লেক্সের পাঁচিল। মূল ফটক আরও কিছুটা দূরে। রিক্সাচালককে ভাগিয়ে তাকে মুখ চেপে বাইকে তুলে নিলেই হল, নিশ্চল তেঁতুলগাছজোড়া ছাড়া কেউ সাক্ষী থাকবে না! নিজেকে ফিরে পায় অনি। প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে। বাঁচাও! বাঁচাও! কিন্তু ভীত, রুদ্ধ কণ্ঠ সাড়া দেয় না। ফ্যাসফ্যাসে একটা আওয়াজ বেরোয়। হেসে ওঠে ছেলেগুলো।

একটা ছেলে এগিয়ে আসে।

‘মাচিস আছে কাকা?’

‘আছে।’

পকেট থেকে একটা দেশলাই বাক্স এগিয়ে দেয় চালক। ছেলেটা একটা কাঠি বার করে সিগারেট ধরায়। ভুরভুর করে ধোঁয়া ছাড়ে। জ্যোৎস্না এসে ধুইয়ে দিচ্ছে অনিন্দিতাকে। চোখ দিয়ে চাটে তাকে ছেলেটা। তারপর ডানদিকের বুকটা কামড়ে কিছুটা খেয়ে নেয়। উরু থেকে খুবলে তুলে নেয় বেশ খানিকটা মাংস। একটু দূরে বাইকের কাছে দাঁড়িয়ে অন্য ছেলে দুটো হাসে।

শেষ-মাঘের হাওয়ায় তেঁতুলপাতার মতো তিরতির করে কাঁপতে থাকে অনিন্দিতা। ঘিনঘিন করে ওঠে গোটা শরীর। বমি পায় তার।

‘চলো হটো! জায়গা দাও!’

রিক্সাচালক চাবি ঘুরিয়ে বেগবান করে বাহন। বাইকটা চালু করে ভটভটিয়ে চলে যায় ছেলেগুলোও।

ফোন বাজে। সঞ্জয়। ফোন ধরে না অনিন্দিতা। কেটে দেয়।

কমপ্লেক্সের মস্ত ফটকের সামনে অনিন্দিতাকে নামিয়ে রিক্সাচালক বলে, ‘বৌদি খুব ভয় পেয়েছিলেন, না? ওদের চিনি আমি। আমাকেও চেনে ওরা। রড আছে আমার গাড়িতে। বেশি ট্যাঙাইম্যাঙাই দেখলে মাথা চ্যালা করে দিতাম না!’

মুখ দিয়ে শব্দ বেরোয় না অনিন্দিতার। ভাড়া চুকিয়ে প্রায়-ছুটে ঢুকে যায় কমপ্লেক্সের অন্দরে। পা টেনে-টেনে ওঠে তিনতলায়। বেল বাজায়। তিনবার বাজানোর পর দরজা খোলে সঞ্জয়। ঘরে ঢুকে হুড়মুড়িয়ে। কতক্ষণ ধরে সে এই ঘরেই আসতে চেয়েছে। কত দীর্ঘ ছিল সে যাত্রা! দম নেয়। শান্তি।

‘ফোনটা বন্ধ রেখেছ কেন?’

‘তুমি এত ঘামছ কেন অনি! এনিথিং রং!’

‘একজন বাড়ির বাইরে আছে! ফোনটা বন্ধ রাখার জিনিস নয়, এটা তোমাকে কে বোঝাবে!’

চটিটা ছেড়ে বেডরুমে ঢুকে যায় অনিন্দিতা। হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে স্ত্রাগ করে সঞ্জয়।

ঘরে ঢুকে ফ্যানটা চালিয়ে বিছানায় বসে অনি। দীর্ঘ একটা শ্বাস নেয়। চোখ বুজে থাকে কিছুক্ষণ।

নিজেকে সামলে উঠে পড়ে। শাড়িটা খোলে। পরনে লাল সায়া। লাল ব্লাউজ। আয়নার সামনে দাঁড়ায়। ওয়াইন ফেসিয়াল করালেও মুখে যেন রাজ্যের কালি। এই কয়েক মিনিট যেন কেড়ে নিয়েছে সমস্ত জৌলুস।

ঘরে ঢোকে সঞ্জয়।

‘আরে অনি, কী পিঠ বানিয়েছ ডিয়ার! সানি লিওনি আমার!’ বলতে বলতেই পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে।

দুই হাতে তার দুই স্তন। ঘাড় গুঁজে জিভ বোলাচ্ছে পিঠে।

সামনে আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকে অনি। তেঁতুলপাতার মতো আবার তিরতির করে কাঁপতে থাকে। ঘিনঘিন করে ওঠে গোটা শরীর। বমি পায় আবার।

সঞ্জয়ের থাবা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে দৌড়ে ঢুকে যায় বাথরুমে।